নজরুলের সাহিত্যচর্চা এবং 'সওগাত'

নজরুল তাঁর জীবনে কখনও অর্থের পেছনে ছোটেননি। তাঁর নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে তিনি কবিতা, গান, গল্প উপন্যাস লিখেছেন। রেডিওতে, হিজ মাস্টারস ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানীতে, গানের পর গান লিখে সুর করে নিজে গেয়েছেন এবং আপরকে দিয়েও গাইয়েছেন। কে অর্ঘ্য দিল, কে দিল না - এ দেখবার সময় ছিল না তাঁর। সাহিত্যকে সাহিত্যের জন্য এমন ভালবাসার এমন মানুষ বাংলা সাহিত্যে বিরল। ফলে সংসারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কখনও জোগাড় হয় নি। পান আর গান তাঁর জীবনের সবটুকু জুড়ে ছিল। এদুটোর সঙ্গে চা দিতে পারলেই হলো -- ব্যাস, কি চান আপনি? গান কবিতা সব তিনি দিতে পারেন। এমন প্রতিভা বিস্ময়করতো বটেই, বলা যায়, অভূতপুর্ব এবং অনন্য। রবীন্দ্রনাথ সচেতন কবি ছিলেন, তিনি তাঁর কবিতা বার বার কাটাছেঁড়া করেছেন, অতঃপর অনুলিপিও রেখেছেন। প্রচুর সময় হাতে পেয়েছেন। বিত্ত এবং চিত্ত কোনটারই অভাব ছিল না তাঁর। নিজে ছবি আঁকতেন। কবিতাকেও ছবির গড়নে লিখেছেন।

নজরুলের এমনটি করার সময় ছিল না। সমাজ এবং জাতির দাবীর কাছে তিনি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। জেলে গিয়েছেন, অসুখে ভুগেছেন, কিন্তু কবিতা, গানকে ছেড়ে থাকেন নি। এরই মধ্যে প্রেম, বিরহ কোন একটার মধ্যে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। হৃদয় যখন যা চেয়েছে, তাইই করেছেন। কেউ তাঁকে প্রেম দিল, ভাল। না হলেও ক্ষতি নেই। একজনকে ভালবাসলেন। কিন্তু তাঁকে পেলেন না কিন্তু মনে তিনি থেকে গেলেন। এর মধ্যে বিবাহ হলো, সেটাও যে নাটক থেকেও বেশী। যাকে ভালবাসলেন, তাঁর সঙ্গে শেষ-মেষ বিয়ে হতে গিয়েও হলোনা। কিন্তু কবি তাঁকে অস্বীকার করলেও কোথাও বুঝি তাঁর সে ভালবাসা রয়ে গেছে মনে। এক বিয়ের পীড়ি থেকে উঠে সরাসরি আর এক বিয়ের পীড়িতে। নিজ ধর্মেরও বাইরে। বলা যেতে পারে মোঘলীয় বিয়ে। ধর্মেও বিয়ে হলো না, ক্ষতি কি, মনের বিয়েতো হয়েছে। মোঘল বাদশারা হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেছেন, কিন্তু ধর্মান্তারিত করেন নি। কিন্তু নজরুলের বিয়েও কি এমনি রাজনৈতিক? অস্বীকার করার উপায় নেই। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম, অবশেষে রূপ নিল অসাম্প্রদায়িক বিবাহে। এখানে নজরুল হিন্দু - মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটালেন। প্রমীলা বধু হয়ে ঘরে এলেন। সন্তান সন্ততি হ'লো। এ বিবাহে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই রুষ্ট হলেন। নজরুলের তাতে

কি যাই আসে। কিন্তু আর্থিক সংকটতো তাঁকে রেহাই দিল না। নজরুলের জন্য সাহায্য রজনী হলো। কিন্তু অর্থের পরিমান দাঁড়ালো 'না বলা বাণীর' মতো। এতবড় কবি হলেন। তাঁর কবিতা-গানের জন্যে গোটা জাতি, হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে উদগ্রীব। কিন্তু কবিতো অভাবীই রয়ে গেলেন। দারিদ্র তাঁকে 'কন্টক মুকুট শোভা' দিল। লোকের মুখেও 'দারিদ্র' কবিতার জয় জয়াকার। অসাধারণ কবিতা হিসেবে দারিদ্র 'শিক্ষাপাঠে' বিবেচিত হ'ল। কিন্ত নজরুলের দারিদ্র তাতে ঘুচলোনা। কৃষ্ণনগরে থাকতে এই অর্থসংকট তীব্রতর ভাবে দেখা দিল। 'মোসলেন ভারত' থেকে 'নওরোজ' প্রভৃতি কাগজে সম্পৃক্ত থেকেও তাঁর অভাব মোচন হ'ল না। প্রকাশকেরা তাঁর বই ছেপে দু'হাত দিয়ে টাকা লুটেছেন। কিন্তু নজরুলের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। নজরুলের আগে তাঁর মতো বড় কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। বিদেশিনী হেনরিয়েটাকে বিয়ে কওে তিনি জাতিচ্যুৎ এবং পরিবার থেকে পরিত্যাজ্য হয়েছিলেন। ফলে পৈতৃক সম্পদলাভে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু নজরুল! তাঁর তো লেখাই ছিল একমাত্র সম্বল। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা থেকে তাঁর প্রতিভা ছিল ভিন্নতর। তাঁর লেখার ধরণও ছিল সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। গতানুগতিক কাব্যরীতি এবং সাহিত্য সমালোচনার উর্ধে ছিলেন তিনি। অনেকেই তাই তাঁর কাব্যরীতি ও সাহিত্য ভাবনা বুঝে ওঠেন নি। কবি কীট্স তাঁর সমকালে কবিস্বীকৃতি পান নি। সমালোচেকরা তাঁর কাব্যকে আমলেই আনতে চান নি কিন্তু বোদ্ধা পাঠকদের কারণেই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছে। কীট্স নিদারুন অর্থসংকটে পড়েছিলেন। অসুস্থ হয়েই তাঁর জীবনাবসান হয়েছিল। নজরুলের সঙ্গে কীট্স এর জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। কীট্স প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন। নজরুল হন নি। কবি শেলী কিন্তু নজরুলের সত্য প্রতিবাদী ছিলেন। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতা পৃথিবীর তাবৎ প্রতিবাদী কবিতা থেকে স্বতন্ত্র এবং বিস্ময়কর। বৃটিশদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন, বিধায় তাঁর 'নোবেল' পদক পাওয়া সম্ভব হয় নি। নজরুল থেকে অনেক ক্ষুদ্র কবি 'নোবেল' বিজয়ী হয়েছেন। নজরুলের তাতে কিছু যায় আসে নি। আজ পৃথিবীর মানুষ তাঁকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জনগন নন্দিত হয়েছেন।

এমন একটি সময় হয়েছিল, নজরুল অর্থাভাবে দিশেহারা। এমনি মুহূর্তে তাঁর পাশে এসে দাড়িয়েছেন 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মাদ নাসিরউদ্দীন। মুজফ্ফার আহমদের মতই তিনি তাঁর প্রতিভার লালন করেছেন অসীম ভালবাসায়। বাড়ী থেকে ডেকে এনেই তাঁকে 'সওগাত' পত্রিকায় বসিয়েছেন। কবির আর্থিক সংকট বেশ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। তিনি প্রাণভরে কবিতা, গান, গল্প লিখেছেন। 'সওগাতে' তাঁকে কেন্দ্র করে তরুণ কবি সাহিত্যেকেরা আবর্তিত হয়েছেন, 'পথের দিশা' পেয়েছেন। 'সওগাত' পত্রিকায় তিনি তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দাকারীদের জবাব দিয়েছেন। ধর্মে ও কর্মে সমাজের তথা জাতির বিরুদ্ধে যারা ভণ্ডামী করেছে, নজরুল তাদেরও সমুচিত জবাব দিয়েছেন। বলতে কি, সে সময় 'সওগাত' তাঁকে 'সঞ্জীবনী সুধা' পান করিয়েছে। এ এক অসাধারণ

কৃতিত্ব 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের। কবিকে আটকিয়ে রেখে কবিতা লিখিয়ে নিয়েছেন খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন। এসম্পর্কে চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন তিনি ঃ "দুপুর বেলা একদিন সওগাত অফিসে বসে আছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন নজরুলকে কে যেন নীচে ডাকছেন। নাসিরউদ্দীন সাহেব বল্লেন ঃ 'তাঁকে এখানেই ডেকে নিয়ে আনুন।" কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বল্লেন, "না, কবিকে নীচেই যেতে হবে।'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম কবি নীচে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। নাসিরউদ্দীন সাহেব আপত্তি করলেন। কারণ আমাদের ধারণা ছিল, একবার হাত ছাড়া করলে শীগ্গীর আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। কবি শুনলেন না। বল্লেন ঃ 'আপনারা বসুন, আমি এক্ষুণি আস্ছি। আমি ঠিক ফিরবো। আচ্ছা আমি আমার গায়ের চাদর রেখে যাচ্ছি। এখন বিশ্বাস হলো ত?" হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে তিনি নীচে নেমে গেলেন। মিনিট দশেক পরে কেমন যেন সন্দেহ হলো। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, কবি নীচে নেই। 'সওগাত' অফিসের আশে পাশে কোথাও নেই! বুঝলাম যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা তাঁকে ঠিক ধরে নিয়ে গেছেন। এতক্ষণ কোন্ আড্ডায় নিয়ে তাঁকে ফেলা হয়েছে, কে জানে! সারাদিনে ভেতর কবি এলেন না।'

এরপর খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন নজরুলের গচ্ছিত রাখা চাদরটা গায়ে দিয়ে ঐ দিন রাত্রে তিনি তাঁর দেশের বাড়ীতে চলে যান। চার পাঁচদিন পরে ফিরে এসে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনকে জিগ্যেস করলেনঃ 'কবি কোথায়?" সওগাত সম্পাদক বল্লেনঃ আজ পর্যন্ত ফিরে আসেন নি। তাঁর চাদরখানা দেখছি ময়লা হয়ে গেছে। ধোপায় দিয়ে দিন।' এর কয়েকদিন পরে নজরুল ফিরে এলেন। জিগ্যেস করলেনঃ 'আমার চাদরখানা কোথায়?'

মোহম্মদ নাসিরউদ্দীন নজরুলের এমন বিচিত্র জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। "আর একদিনের ঘটনা। তখন নজরুলের ধারাবাহিক উপন্যাস 'মৃত্যুক্ষুধা' নিয়মিত 'সওগাতে'বের হচ্ছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশ ও একটি গানের বিশেষ প্রয়োজন। না দিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে 'সওগাত' বের হবে না। নজরুলকে ধরে আনা হলো। তখন বেলা আন্দাজ এগারোটা। প্রথমে চা ও পান জর্দা দিয়ে তাকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করলাম; এরপর দুপুরে একত্রে আহার করলাম। আহারের পর তাঁকে বল্লাম ঃ আপনার উপন্যাসের পরবর্তী অংশ ও গান না পেয়ে ছাপার কাজ বন্ধ আছে। এ দু'টি পেলেই কাগজ বেরিয়ে যাবে। কাগজ কলম এনে দিচ্ছি। লিখতে বসুন। নজরুল গম্ভীরভাবে বল্লেনঃ 'আজ একটা জরুরী কাজ রয়েছে, এক্ষুণি আমাকে বের হতে হবে। কাল এসে লিখে দেব।" আমি মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো আড্ডায় যাবেন দাবা খেলতে। গান আর দাবা খেলার নামে নজরুল ছিলেন পাগল। এখন ছেড়ে দিলে আবার কখন লেখা পাব কে জানে? বিশেষ করে 'সওগাত' বের হতে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। আমি কবিকে একটা আলাদা কামরায় নিয়ে গেলাম এবং কাগজ কলম সব দিয়ে বল্লাম ঃ এবার লিখ্তে আরম্ভ করুন। লেখা হয়ে গেলে ডাকবেন। এই পান জর্দাও রেখে গেলাম।

নজরুল যেন একটা বিপদে পড়লেন। আমি বাইরে থেকে কামরার দরজায় তালা বন্ধ করে দিলাম; শুধু শিকল বন্ধ করলে যদি কেউ খুলে দেয় এই ভয়ে। নিরুপায় হয়ে তিনি কতকটা লিখলেন কিন্তু যাবার জন্য ছটফট করতে লাগলেন। একটু পরেই চীৎকার করে বলে উঠলেন। শুনছেন? আমি পায়খানায় যাবো। দরজাটা একটু খুলে দিন। শিশু সুলভ তাঁর কথা। পাশের হল কামরায় আমি কাজ করছিলাম। এগিয়ে এসে বল্লাম ঃ "ভিতরে এক কোনে 'কমোড' আছে, সেখানে যান। কবি আবার চিৎকার করে বল্লেন ঃ কমোডে যাবার অভ্যাস আমার নেই। মেহেরবাণী করে দরজাটা খুলে দিন।" আমি বল্লাম ঃ "বিপদে পড়লে মানুষ কত জায়গায়ই গিয়ে থাকে, কমোড ত ভাল ব্যবস্থা।" কবিকে বলতে শুনলামঃ "কি লোকের পাল্লায়ই পড়েছি রে, আল্লা!"

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা। কবি ঘরের ভেতর থেকেই আবার উচ্চকণ্ঠে বল্লেনঃ আমার লেখা শেষ হয়েছে, বিশ্বাস না হয় দেখে যান। তাঁর কথার ধরনে বুঝলাম, লেখা শেষ হয়েছে। এবার দরজাটা খুলে দিলাম। আমি মনে করেছিলাম তিনি বুঝি খুব বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুখে বিরক্তির লেশমাত্র নেই। লেখাসহ হাসতে হাসতে বের হয়ে এলেন। বল্লেন ঃ খুব ভাল লেখা হয়েছে পড়ে শোনাবো? আমি বল্লামঃ চলুন, আগে চা খেয়ে নেয়া যাক। পাঁচটা বেজে গেছে।

আমাদের চা খাওয়া ও কথাবার্তা চলতে চলতেই সওগাত দলের লেখকেরা একে একে সমবেত হতে লাগলেন। কবি তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। তাঁর উপন্যাসের অংশটুকু এবং যে গান লিখেছিলেন, তা পড়ে শোনাতে লাগলেন। এরপর আরো আনেকে এসে গেলে তিনি গানটি গেয়ে শোন লেন। নানা আলোচনা সমালোচনা ও গান শেষ করতে রাত ১১টা বেজে গেল। নিজের লেখা গান নিজে গেয়ে কবির কি হাসি, কি আনন্দ! আর ভক্তবৃন্দের একের গায়ে অন্যের ঢলে পড়ার দৃশ্য আজও মনে পাড়ে।

আমি আনেকবার আনেক উপায়ে আটকিয়ে রেখে নজরুলকে দিয়ে কবিতা-গান লিখিয়ে নিয়েছি। তিনি কিন্তু সে জন্য মনে কিছু করতেন না; বরং আনন্দের সাথে কবিতাগুলি আবৃত্তি করতেন, গানগুলি সুর দিয়ে গাইতেন।

এমন মানুষই ছিলেন নজরুল। আচার-আচরণে কোন অহমিকা ছিল না। শিশুসুলভ সারল্য তাঁর জীবন জুড়ে ছিল। অসম্ভব রকম বন্ধু প্রীতি ছিল তাঁর। দুঃখের মধ্যেও তিনি হাসতে পারতেন। গাইতে পারতেন, লিখতে পারতেন। মুখে দেখে কেউ বুঝতে পারতনা তাঁর কষ্টের কথা। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে কোন চাকুরীতে যোগদেন নি তিনি। লেখাকেই পেশা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাতে তাঁর মন ভরেছে ঠিকই কিন্তু পেট ভরে নি। নজরুলের বিত্তবান বন্ধু ছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে অর্থ দিয়ে তেমন সাহায্য করেন নি। 'সওগাতের' মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ও কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধু তাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর জন্যে 'সাহায্য রজনী' করতে হয়েছিল। 'বিদ্রোহী' কবিতার পরবর্তীতে তাঁর লেখা 'দারিদ্র' কবিতা ছিল তাঁর জীবন থেকে নেওয়া সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।